শিক্ষা দিবসে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১৭ সেপ্টেম্বর সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের শিক্ষা দিবসের র‍্যালি

- **সবার শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত কর**
- **শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ, সন্ত্রাস, দখলদারিত্বমুক্ত গণতান্ত্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোল**
- **ডাকসুসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিশ্চিত কর**

শিক্ষা দিবসের ৫৬তম বার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর '১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন, বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আল কাদেরী জয়, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি জিলানি শুভ, ছাত্র ফ্রন্টের অর্থবিষয়ক সম্পাদক রুখসানা আফরোজ আশা, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মনীষা চক্রবর্ত্তী, সদস্য মুক্তা বারৈ, আলমগীর হোসেন সুজন। সমাবেশ পরিচালানা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স। সমাবেশ শেষে লাল পতাকা ও দাবি সম্বলিত ফেস্টুন সহকারে সুসজ্জিত র‍্যালি ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি সম্পর্কিত একটা নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করে, যার সভাপতি তৎকালীন শিক্ষাসচিব এসএম শরীফের নামানুসানে ওই কমিশনের নাম হয় শরীফ শিক্ষা কমিশন। ৫৮ সালের ডিসেম্বরে কমিটি গঠিত হয় আর প্রতিবেদন উপস্থাপন করে ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট। রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায় এতে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কারিকুলাম, অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনাসম্বলিত ২৭টি অধ্যায়ে স্বৈরাচারী-অগণতান্ত্রিক-অবৈজ্ঞানিক ও মুনাফাকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠেছে। শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি এক কথায় প্রকাশিত হয়েছিলো যে, শিক্ষা সস্তায় পাওয়া যাবে না। ছাত্রসমাজসহ সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকবৃন্দ ওই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সেই প্রতিবাদ ছাত্র গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৭ সেপ্টেম্বর আন্দোলনে গুলিতে প্রাণ হারান মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজি উল্লাহসহ আরও অনেকে। সেই আন্দোলন যে সমাজের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অংশকেও ঐক্যবদ্ধ করে তার প্রমাণ যারা শহিদ হয়েছেন—মোস্তাফা, তিনি ছিলেন পূর্বপাকিস্তান সড়ক পরিবহনের একজন কন্ড্রাকটার, ওয়াজি উল্লাহ, তিনি ছিলেন গৃহভৃত্য। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পর এই আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের বুর্জোয়া শাসকরা যে কোন সংগ্রামকেই ভয় পায়, সেটা অতীতের হোক বা বর্তমানের হোক। তাই অতীতের সংগ্রামকে তারা আড়ালে রাখতে চায়, সামনে আসতে দেয় না। আমাদের দেশের সংবাদপত্র, টেলিভিশন খবর প্রচার করে—বাবা দিবস, মা দিবস, ভালোবাসা দিবস কিন্তু তারা শিক্ষা দিবসের কোন সংবাদ জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রচার করে না। নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের সামনে সংগ্রামের ইতিহাস, আন্দোলনের গৌরবগাঁথা তুলে ধরে না, গোপন রাখে। কারণ বর্তমান শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি, শাসনপদ্ধতি অতীতেরই ধারাবাহিক। তাই আমরা দেখি ব্রিটিশ আমলের শিক্ষানীতি, পাকিস্তান আমলের শিক্ষানীতি ও বাংলাদেশ আমলের শিক্ষানীতির মধ্যে সময়ের পার্থক্য ও শব্দ-বাক্যের পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্যের কোন ফারাক নেই। সময়ের ইতিহাসে শাসকের বদল ঘটেছে কিন্তু শোষণের মানসিকতার বদল ঘটেনি। তাই শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতির সাথে ২০০৯-এ গঠিত কবির চৌধুরীর শিক্ষা কমিশনের মূলগত পার্থক্য নেই। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট পূর্বসূরিদের লড়াই-সংগ্রাম, ত্যাগের ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আসতে চায়। পূর্বপুসূরিরা হচ্ছে সমাজের শিকড়, ইতিহাস ঐতিহ্যের শিকড়; শিকড় বিহীন কচুরিপানা যেমন পানিতে ভেসে বেড়ায়, শিকড় বিহীন মানুষকে দিয়েও যেকোন কিছু বিশ্বাস করানো যায়। তাই একটা জাতিকে বড় হতে হলে ইতিহাসের শিকড় থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

ইতিহাসের শিকড় আমাদের বর্তমানকে ফুলে-ফলে-পত্রে সজ্জিত করবে। আমরা আমাদের অতীতের লড়াইয়ের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমানে অধীকার আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনা করতে চাই।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ৬২-র শিক্ষানীতির সব কথা সে দিন সাধারণ মানুষ পড়ে দেখেনি কিন্তু তারা বুঝেছিলো ওই শিক্ষানীতি কার্যকর হলে মানুষের শিক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। সেই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিলো—শিক্ষা সস্তায় পাওয়া যাবে না। শিল্পে বিনিয়োগকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি শিক্ষায় বিনিয়োগকেও সেই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। শিল্পে বিনিয়োগ কেন করে? শিল্পে বিনিয়োগ করে শ্রমিকের শ্রম সস্তায় কিনে উৎপন্ন দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্যই পুঁজিপতির লাভ বা মুনাফা। শিক্ষায় বিনিয়োগকেও মুনাফার দৃষ্টিতে দেখতে হবে? তারা বললো উর্দু ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা হলেও তাকে গোটা জনগোষ্ঠীর ভাষায় পরিণত করতে হবে। বর্ণমালা পরিবর্তণের প্রস্তাবনা নিয়ে এলেন। মানুষ তখন বুঝেছিলো শিক্ষা বাণিজ্যের পণ্যে রূপান্তরিত হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে দোকান আর ছাত্ররা হবে ক্রেতা। এটা শিক্ষাদর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। মানুষের শিক্ষা পাওয়া উপেক্ষিত হবে, শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের সন্তান শিক্ষা পাবে না। আর জনসাধারণকে অশিক্ষিত রেখে দিতে পারলেই তো শাসকদের লাভ। মানুষ তখন বিনা প্রতিবাদে সবকিছু মেনে নিবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষা কেন চাই? নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার জন্য শিক্ষা চাই, সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য শিক্ষা চাই, শোষণ-বঞ্চনা দূর করার জন্য শিক্ষা চাই, মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরির শক্তির জন্য শিক্ষা চাই–উত্তর খোঁজার সামর্থের জন্য শিক্ষা চাই। এই শিক্ষার অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা মানে মানুষকে মানবেতর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া। ইংরেজ আমলে ১৮১৩ সালে লর্ড ম্যাকলের নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি তৈরি করেছিলেন—এর অর্থ ওপর থেকে চুইয়ে পড়বে। ইংরেজ, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ আমলের শিক্ষা নীতির মধ্যে একটা ঐক্য আছে, তা হলো শিক্ষা পাবে গুটিকয়েক মানুষ, এই মুষ্টিমেয় মানুষকে দিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শাসন করা। এখন আমাদের প্রাইমারি স্কুলের পরীক্ষা দেয় ২৯ লাখ, এসএসসি ২০ লাখ আর এইচ এইচ সি পরীক্ষা দেয় ১৪ লাখ। সবকয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হতে পারে মাত্র আড়াই লাখ। পঞ্চম শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছুতে ২৯ লাখ থেকে ছাত্র সংখ্যা নেমে এলো আড়াই লাখে। এই হলো শিক্ষানীতির ফল। প্রচার হচ্ছে, মানব উন্নয়নসূচকে আমরা এগিয়েছি—কিন্তু পিছিয়েছি শিক্ষা-স্বাস্থ্য আর সামাজিক নিরাপত্তায়। শিক্ষা খাতে আমাদের বরাদ্দ ভারত, নেপাল, পাকিস্তান থেকে কম। আজকে উন্নয়নের এত কথা বলা হচ্ছে। আজ শাসকদের উন্নয়নের ঢাক বাজানো দেখে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। তিনি ব্রিটিশদের সমালোচনা করে বলেছিলেন—শাসকগোষ্ঠী উন্নয়নের পালে ফু দিচ্ছে তাতে গাল যত ফুলে পাল তত ফোলে না। ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ইশতেহারে কার্ল মার্কস বলেছিলেন—যা কিছু মানুষের মহত্তম পেশা ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষকতা সবকিছুকে তারা পুঁজির অধীন করে ফেলেছে, পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। সেই পুঁজিবাদী নিয়ম যদি বহাল থাকে শিক্ষা পণ্য হবেই। তাই আমাদের শিক্ষার অধিকারের সাথে সাথে পুঁজিবাদ বিরোধী লড়াইটাকে একসূত্রে গ্রথিত করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, প্রচলিত শিক্ষায় আমাদের সাক্ষরতার হার বাড়লেও শিক্ষার মান কমছে। এখন ছাত্ররা সার্টিফিকেট পাচ্ছে শিক্ষা পাচ্ছে না, পরীক্ষা থাকছে ক্লাস থাকছে না। স্কুল-কলেজে হবে পরীক্ষা আর শিখতে হবে কোচিং-এ, প্রাইভেট মাস্টারের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স-কারিক্যুলামের গালভরা নাম হবে কিন্তু শিক্ষার মর্মবস্তু হারিয়ে যাবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা লড়াই করেছিলেন সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষার জন্য কিন্তু তা হয়নি, সেই শিক্ষার জন্য ।র লড়াই শেষ হয়নিদআমা ।র লড়তে হবেদরণের জন্য আমাপ্রেপ্বস্ —তার বাইরে ,াকতে হবেথশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস রুমে পরিবেশ হল-হোস্টেল, ক্যান্টিন, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি-সেমিনার রুমেও সে পরিবেশ থাকতে হবে। কিন্তু আজকে কোথায়ও সেই পরিবেশ নাই। শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, কোথায়ও কথা বলা যাবে না, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা যাবে না। আমাদের বাস করতে হয় ভয়ের-ত্রাসের রাজত্বে। সেখান থেকে আমাদের মুক্তচিন্তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষার ভিত্তি হবে বিজ্ঞান, শিক্ষা হবে সেক্যুলার, শিক্ষা হবে গণতান্ত্রিক, শিক্ষা সকল মানুষের জন্য। আজকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সংসদ নির্বাচন নাই, শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন নাই, সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার নাই। কিন্তু শিক্ষকদের নির্বাচন হয়, কর্মচারী সমিতির নির্বাচন হয়, অফিসার্স সমিতির নির্বাচন হচ্ছে, শিল্পমালিকদের নির্বাচন হয়, বণিকসমিতির নির্বাচন হয়। দেশে এখন মানুষের বাকস্বাধীনতা নেই, সভাসমাবেশের অধিকার নেই–সেখানে ছাত্রদের শিক্ষার অধিকারও থাকতে পারে না। শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন নেই, শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন নেই, নারী সমাজের আন্দোলন নেই, পেশাজীবীদের আন্দোলন নেই–এটা চিরস্থায়ী দৃশ্য নয়। আমরা দেখেছি ঝড়ের আগে একটা থমথমে গুমট পরিবেশ তৈরি হয়, তার পর ঝড় এসে সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। অতীতের ইতিহাস বলে ছাত্র-যুবশক্তি এই অন্যায় বেশি দিন মেনে নেয় না। ভ্যাট বিরোধী আন্দোলন, কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবির আন্দোলনে ছাত্র-যুবসমাজ তাদের শক্তি দেখিয়েছে। আমাদের শিশু কিশোর'রা বলেছে, রাষ্ট্রের মেতামত চলছে সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত। তারা রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দেখিয়েছে কীকরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হয়। সরকার সেই আন্দোলনকে দমনপীড়নের মধ্যদিয়ে দমাতে চেয়েছে কিন্তু এই দমনপীড়নের ফল হয় ভয়াবহ। গণতন্ত্রহীন শাসরুদ্ধকর পরিবেশ চিন্তার বিকাশের জন্য বাধা। ৬২'র শিক্ষাআন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হয়। আজও এই গণতন্ত্রহীনতার সমাজ থেকে আমাদের বের হতে হলে ছাত্রসমাজকে

ঐক্যবদ্ধ লড়াইতে নামতে হবে। অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। আর এই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের হাতিয়ার নীতিনিষ্ঠ-আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন সমাজান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পতাকাতলে সমবেত হয়ে অতীতের গৌরব ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাবে এই হোক শিক্ষা দিবসের অঙ্গীকার।